ইতিহাস এষণা ৪
ISBN: 978-81-953260-9-9

অবাঙালি হিন্দু চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান

শত্রুঘ্ন কাহার*

বাংলার চটকল শ্রমজীবীদের সাংস্কৃতিক জীবনে অন্যতম দিক হল তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান। প্রথমেই বলা হয়েছে এই চটকল শ্রমিকরা বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা ও প্রদেশ থেকে আসা এক বৈচিত্র্যময় শ্রেণী। এদেরকে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক ঐক্যসূত্রে বেঁধে আলোচনা সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষার লোক চটকলের একই ছাদের তলায় কাজ করলেও তাদের নিজ ভাষা ও ধর্মের প্রতি আস্থা ছিল গভীর। সম্ভবত গ্রাম থেকে ছিন্ন মূল এই শ্রমজীবীদের জীবনে বেঁচে থাকার শেষ সম্বল ছিল তাদের এই ধর্ম ও ভাষা। সুতরাং এই ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে তাদের জীবনে নানান আচার অনুষ্ঠান। ধর্মীয় সংখ্যাগত দিক থেকে দেখলে চটশিল্পে হিন্দিভাষী হিন্দু শ্রমিকের সংখ্যা বেশি, আবার জাতপাতের বিচারে দলিতদের সংখ্যা বেশি। তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। মুসলিমদের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পালিত পরব চটকল অঞ্চলেও লক্ষ্য করা যায়, আবার অন্যদিকে অবাঙালি হিন্দু শ্রমিকদের মধ্যে কিছু মৌলিক ধর্মীয় আচার আচরণ এই অঞ্চলকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে বৈচিত্রময় করে তোলে। আলোচ্য প্রবন্ধে অবাঙালি হিন্দিভাষী শ্রমজীবীদের মধ্যে প্রচলিত এই ধরনেরই কিছু উৎসবের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

শব্দসুচক- চটকল, শ্রমজীবী, সংস্কৃতি, ধর্ম, জিতিয়া, ছটপুজা, হোলি, মকর সংক্রান্তি।

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

বাংলায় প্রথম চটকলটি গড়ে উঠেছিল হুগলী জেলার রিষড়ায় ১৮৫৫ সালে। পরবর্তী দুই দশকে চট শিল্পের প্রসার ঘটে দ্রুত। ফলে ১৮৯০ এর দশক থেকেই দলে দলে বিহার, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ থেকে অভিবাসী শ্রমিকেরা বাংলায় ভিড় করতে থাকে।[১] প্রধানত অর্থনৈতিক কারনে তারা বাংলায় এলেও তাদের কর্মকাণ্ড শুধু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই সীমিত থাকে নি, বরং তা বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি তথা রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। দীর্ঘ ১২০ বছর বাংলায় বসবাস করায় এই চটকল শ্রমিকদের এক নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তাদের এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাকে কোনও বাঁধাধরা ছকে বিভক্ত করে আলোচনা করা সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন বাংলায় থাকা এবং আদি গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার দরুন উক্ত অঞ্চলগুলিতে এক মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব সহজেই অনুমেয়।

স্বাধীনতা উত্তর পর্বে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা বোঝার জন্য প্রাক স্বাধীনতা যুগে বাংলার চটকল অধ্যুষিত অঞ্চলে এদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফিরে দেখা উচিত। প্রধানত অর্থনৈতিক কারনকে কেন্দ্র করেই তারা বাংলার অভিমুখে যাত্রা করায় তাদের অভিবাসনের প্রাথমিক পর্বে সাংস্কৃতিক বিবর্তন তেমন নজরে পড়ে না। বস্তুত এই সময় গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে ছিন্নমূল এক প্রাণীর মতই তারা বাংলায় বসবাস করতে থাকে। দ্বিতীয়ত যে কোনও সমাজে তার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হচ্ছে সেই সমাজের নারী। প্রাক স্বাধীনতা যুগে এই চটকল শ্রমিকরা সপরিবারে বাংলায় বসবাস করত না। তাদের পরিবার গ্রামে থাকায় চটকল অঞ্চলে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতিফলন প্রথম পর্বে তেমন নজরে পড়ে না। আবার কিছু গ্রামীণ নারী এই সময় পর্বে চটকলের কাজে নিযুক্ত হলেও তারা ছিলেন গ্রামীণ জীবনে পতি-পরিতক্তা, বিধবা নারী, যারা সর্বস্ব নিঃস্ব হয়ে বাধ্য হয়েছিল বাংলার চটকলে কাজ করতে।[২] এই নারীদের চটকলের পুরুষ শ্রমিক ভালো চোখে দেখে নি। ফলে তারা সমাজে তেমন মর্যাদাও পাই নি। তৃতীয়ত যে কোনও সমাজে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাসে তাদের শিক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। প্রথম পর্বে গ্রাম থেকে ছিন্নমূল হয়ে যে সমস্ত অভিবাসী শ্রমিক চটকলে নিযুক্ত হয় তাদের প্রায় সকলেই ছিল নিরক্ষর। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে যখন এই অভিবাসী

শ্রমিকরা বাংলায় স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয় তখন এদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার ঘটে যা শ্রমজীবীদের নিজস্ব সংস্কৃতির জন্ম দেয়। চতুর্থ প্রাক স্বাধীনতা কালে শ্রমজীবীদের সাংস্কৃতিক জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাদের ধার্মিক আচার অনুষ্ঠান। অমল দাসে প্রবন্ধ 'বাংলার চটকল শ্রমিকদের চটকল বহির্ভূত জীবন' তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের কিছু প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এই উৎসব-পার্বণকে কেন্দ্র করে ছুটির আবেদন এবং ছুটি আদায়ের জন্য জোরাল দাবী বা প্রতিবাদ তাদের জীবনে উৎসব পার্বণের গুরুত্বকেই তুলে ধরে।[৩] তবে প্রাক স্বাধীনতা যুগে এই চটকল শ্রমজীবীদের সাংস্কৃতিক জীবনে বিবর্তনের ধারা ছিল মন্থর। কিন্তু কালক্রমে এই অভিবাসী শ্রমিকরা বাংলায় স্থায়ী শ্রমিকে রূপান্তরিত হতে থাকলে তাদের এক পৃথক সাংস্কৃতিক জীবনের রূপরেখা ক্রমশ স্পষ্টতর হতে থাকে।

বাংলার চটকল শ্রমজীবীদের সাংস্কৃতিক জীবনে অন্যতম দিক হল তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান। প্রথমেই বলা হয়েছে এই চটকল শ্রমিকরা বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা ও প্রদেশ থেকে আসা এক বৈচিত্র্যময় শ্রেণী। এদেরকে শুধু মাত্র অর্থনৈতিক ঐক্যসূত্রে বেঁধে আলোচনা সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষার লোক চটকলের একই ছাদের তলায় কাজ করলেও তাদের নিজ ভাষা ও ধর্মের প্রতি আস্থা ছিল গভীর। সম্ভবত গ্রাম থেকে ছিন্ন মূল এই শ্রমজীবীদের জীবনে বেঁচে থাকার শেষ সম্বল ছিল তাদের এই ধর্ম ও ভাষা। সুতরাং এই ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে তাদের জীবনে নানান আচার অনুষ্ঠান।

প্রাক স্বাধীনতা যুগে চটকলের মালিকেরা চটকলের শ্রমিকদের জাত-পাতের বিচার থাকায় কুলি লাইনগুলিকে যতদূর সম্ভব সেভাবে ভাগ করে শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা করত। এমনকি একাধিক সরকারি রিপোর্ট ও প্রতিবেদনে কুলি লাইনগুলিতে বিভিন্ন জাতের শ্রমিকদের পৃথক পৃথক ভাবে বসবাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই 'কুলি লাইনে' নিম্ন জাতের লোক ছাড়াও উচ্চ জাতের লোকও – যেমন ব্রাহ্মন ও কায়স্থরা বসবাস করত। কোনও কোনও চটকলে জাতপাতের বিচার অত্যন্ত কঠোর ছিল। তবে কোম্পানি নির্মিত কুলি লাইনে ঘরের সংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমানে না থাকায় শ্রমিকরা প্রধানত চটকলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্দারদের ভাঁড়া দেওয়া কুঁড়ে ঘরে বা বেসরকারি জমির

মালিকদের নির্মিত বস্তিতে বাস করত। চটকল শ্রমিকরা সর্দারদের ভাঁড়া দেওয়া বস্তি বা কুঁড়ে ঘরে, মিল মালিকদের কুলি লাইন বা অন্যত্র বসবাস করলেও এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে তাদের সামাজিক মেলামেশার ও সংযোগের বিভিন্ন স্থান ছিল। নানা উৎসব-পার্বণের সময় তারা চটকল পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে জমায়েত হত। বিভিন্ন উৎসবের সময় চটকল শ্রমিকরা মিল ম্যানেজারের কাছে ছুটির আবেদন করে তা আদায় করে নিত। ছুটি না দিলে অনেক সময় তারা বিক্ষোভ বা প্রতিবাদে ফেটে পড়ত। বাংলার চটকলের হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকগন দুর্গাপূজা, দোল, রথযাত্রা, মহরম, ঈদ পালনের জন্য ছুটি দাবি করত।[৪]

স্বাধীনতা উত্তর পর্বে প্রথম দুই দশক তাদের ধার্মিক বিশ্বাস তথা আচার অনুষ্ঠানে তেমন কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। মূলত এ পর্বেও বিভিন্ন পুজো পার্বণকে কেন্দ্র করে ছুটির আবেদন করত এবং ছুটিতে বিহার, উত্তর প্রদেশে স্ব-গ্রামে পরিবারের সাথে পুজো উৎযাপন করত এই শ্রমজীবীরা। এই পুজো উৎযাপন ছাড়াও তাদের ধার্মিক বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই বস্তি অঞ্চল জুড়ে একাধিক পুরনো মন্দির-মসজিদ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। প্রায় প্রত্যেক বস্তিতে একাধিক মন্দির লক্ষ্য করা যায়। আবার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে তাদের জন্য মসজিদ ও কবরখানার উপস্থিতি সহজে নজরে পড়ে। প্রধানত এই মন্দির মসজিদকে কেন্দ্র করেই তাদের দৈনন্দিন জীবনের ধর্ম বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আবাব এই মন্দির-মসজিদকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও দেখা যায়।[৫]

এই মন্দির মসজিদের পাশাপাশি বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এরা নিজ ধার্মিক বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদিতে যেমন সামাজিক সংযোগের পরিবেশ তৈরি করত তেমনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানেরও এরা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হত। সপ্তাহে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, কারখানা ও কারখানার বাইরে দুর্বিষহ জীবন, এমনকি রবিবার দিনেও শ্রমিকদের কাছ থেকে জোর করে কাজ আদায় করে নেওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী শ্রমিকদের ক্লান্ত ও বিষাদ গ্রস্ত করে তুলে ছিল। এই জীবন থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদ তাদের কাছে একান্তভাবে অনুভূত হত। উৎসব পার্বণে এই ছুটি ছাটা তাদের অবসর উপভোগের সুযোগ এনে

দিত। চটকলের বাঙালি হিন্দু শ্রমিকগন দুর্গাপূজা, রথযাত্রা, দোল উৎসবের সময় তাদের বিভিন্ন সংগঠন ও গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলনের সুযোগ সুবিধা লাভ করত। নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময় হত। শ্রমিকরা বিভিন্ন ব্যক্তি, দোকানদার ও শ্রমিকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করত এবং দুর্গাপূজার সময় মেলা, গান বাজনার আয়োজন করত। আবার তাদের গ্রামীণ পুজা অর্থাৎ ছটপুজো্র সময় ছুটি নিয়ে গ্রামে যেত সপরিবারে ছট পুজা উৎযাপনের জন্য।। ঠিক একই ভাবে ঈদ ও মহরম উৎসবের সময় মুসলমান শ্রমিকরা দলবদ্ধ ভাবে চটকলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জড়ো হত। তাঁরা নিজেরা চাঁদা দিত, স্থানীয় মানুষজনের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করত। বাদ্যসহকারে মিছিল করত ও সকলে দলবদ্ধ ভাবে মিছিলে যোগদান করত। এই সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে মজবুত করার চেষ্টা করত। এই সামাজিক মিলন শ্রমিকদের ঐক্যবোধ এনে দিত, যা তাদের মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ধর্মঘটে শক্তির উৎস স্বরূপ ছিল। অন্যদিকে হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকদের তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উৎসব অনুষ্ঠান পালনের জন্য সংযোগ ও সংহতির পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক চেতনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সংকীর্ণ চেতনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক সময় হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করত।[৬]

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে চটকল শ্রমিকদের বেতনসহ নির্দিষ্ট কিছু ছুটি নির্ধারিত হয়। ২৬ শে জানুয়ারি, ঈদ-উল-ফিতর, ইদ-উল-জোহা, হোলি, ১৫ই আগস্ট, মহরম, দুর্গাপুজা (২দিন), ২লা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন এবং পরবর্তীকালে এর সাথে যুক্ত হয় ১লা মে শ্রমদিবসের ছুটি।[৭] ছুটির দিন গুলি বিশ্লেষণ করলে সহজে অনুমান করা যায়, চটশিল্পে হিন্দু হিন্দিভাষী হিন্দু শ্রমিক অপেক্ষা মুসলিম শ্রমিকরা স্থায়ী শ্রমিক রূপে চটকলে যুক্ত ছিল, বলেই তাদের প্রধান প্রধান উৎসবে সবেতন ছুটি দেওয়া হয়েছিল। পক্ষান্তরে হিন্দিভাষী শ্রমিকদের চরিত্র ছিল অনেক বেশি অস্থায়ী যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তাদের সবেতন ছুটিতে। কিন্তু কালক্রমে তারাও বাংলায় স্থায়ী বসবাস করায় তাদের গ্রামীণ আচার অনুষ্ঠান বাংলায় ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হিন্দিভাষী অবাঙালি শ্রমজীবীদের এই আচার অনুষ্ঠানকে দু ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে,

১ কমিউনিটি বেস উৎসব অর্থাৎ সমগ্র হিন্দিভাষী শ্রমজীবীরা যে সকল উৎসবে মিলিত ভাবে উৎযাপন করে, যেমন- জিতিয়া, ছটপুজা, হোলি, মকর সংক্রান্তি ইত্যাদি।
২ ব্যক্তি বিশেষ উৎসব অর্থাৎ যে উৎসবগুলি মূলত ব্যক্তি কেন্দ্রিক বা পরিবার কেন্দ্রিক যেমন- করওয়া চৌথ, একাদশী, তিজ, আনন্দ উৎসব, সত্যনারায়ন কথা ইত্যাদি।
আলোচ্য প্রবন্ধ আমরা মূলত তাদের কমিউনিটি বেস উৎসব নিয়েই আলোচনা করব।

জিউতিয়া বা জীবিত পুত্রিকা ব্রত

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বাংলার অন্যান্য সমস্ত পুজো পার্বণে এই অবাঙালি শ্রমজীবীরা অংশ গ্রহণ করলেও এদের নিজস্ব কয়েকটি উৎসবের কথা এখানে আলাদা করে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলি তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বিবর্তনের ছবি তুলে ধরে। এপ্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় 'জিউতিয়া বা জীবিত পুত্রিকা ব্রত' উৎসবের কথা। বাংলায় হিন্দিভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলে উৎসবটি জিউতিয়া নামে পরিচিত হলেও ভোজপুরী অঞ্চলে এই উৎসব জীবিত পুত্রিকা ব্রত নামেও পরিচিত। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর দিন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আজও বাঙালিদের কাছে এ উৎসব এক আতঙ্কের উৎসব। বস্তুত এই জিতিয়া উৎসবের সঙ্গে সংযুক্ত কিছু অপসংস্কারই তাদের কাছে আতঙ্ক বলে মনে হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার দরুন প্রবীণ চটকল শ্রমিকদের কাছ থেকে জানা যায় তাদের সময় অর্থাৎ আজ থেকে ১০-২০ বছর আগে জিতিয়া উৎসবের আগের মধ্যরাতে এই হিন্দিভাষীদের ঘরের অল্প বয়স্ক ছেলেরা সম্মিলিত হয়ে রাস্তার আশে পাশে দোকান-পাট ঘর-বাড়ির দিকে ইট ও মাটির তৈরি ঢিল ছুড়তে ছুড়তে ও কিছু প্রবাদ চিৎকার সহকারে ঘুরে বেড়াত।

"চিড়িয়া চিল্লোর মচ্ছলি কে ঝোল,
মচ্ছলি কে মাইকে লে গাইল চোর"[৮]

ফলে ঐ সমস্ত অঞ্চলে অধিবাসীদের বাড়ির কাঁচ, দোকানের সাটার ইত্যাদির ব্যাপক ক্ষতি হত। ফলে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে যে আর্থিক ক্ষতি হত তার জন্য বাঙালিদের সঙ্গে এই অবাঙ্গালিদের মধ্যে এক সংঘর্ষে বাতাবরণ তৈরি হয়।[৯]

এই অপসংস্কৃতি বাইরে হিন্দিভাষীদের জীবনে এই উৎসবের এক বিশেষ গুরুত্ব ছিল। বলতে হয় এই উৎসবের প্রানকেন্দ্র ছিল এই চটকল শ্রমজীবীদের বাড়ির মহিলারা। প্রধানত বিবাহিত মহিলারাই এই উৎসব পালন করত। ক্ষেত্রসমীক্ষার দরুন জানা যায় প্রায় সমস্ত অবাঙালি হিন্দিভাষীদের বাড়িতেই এই উৎসব হয়। উৎসবের দিন ভোর সকালে এই হিন্দিভাষী মহিলারা 'সরগি' অর্থাৎ কিছু অন্ন মুখে নিয়ে উৎসব আরম্ভ করে। উৎসবের দিন ও রাত বিনা অন্ন জলে ভগবানের কাছে পার্থনা করে নিজ স্বামী ও সন্তানদের জন্য দীর্ঘ আয়ু কামনা করে থাকে। বস্তুত এই উৎসবের দ্বারা তারা নিজ পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও নিজ পরিবারের পুত্র সন্তানদের মঙ্গল কামনা করে থাকে। উৎসবের পর দিন বাড়িতে ভালো মন্দ রান্নাবান্না করা হয় এবং নিজ আত্মীয় স্বজনদের আমন্ত্রিত করে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া হয়। ফলে ৭০ এর দশক থেকে বৃহৎ পরিবারে যে বিভাজন দেখা যায় তা এই উৎসবের দ্বারা একে অপরের কাছে আসতে সক্ষম হয়।[১০]

ছটপুজো

'জিতিয়া' উৎসবকে কেন্দ্র করে বাঙালি ও হিন্দিভাষীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষে বাতাবরণ তৈরি হলেও তাদের ওপর এক উৎসব 'ছট পুজা'কে কেন্দ্র করে এক পৃথক চিত্র পরিলক্ষিত হয়। ছট পুজা বিহার ও উত্তর প্রদেশের অন্যতম প্রধান পুজা। স্বাধীনতা উত্তর প্রথম দুই দশক যখন এই শ্রমিকেরা সপরিবারে বাংলায় থাকত না তখন এই ছট পুজোকে কেন্দ্র করে শ্রমিকরা ছুটি নিয়ে গ্রামে চলে যেত পরিবারের সাথে এই উৎসব উৎযাপনের জন্য। ৭০ এর দশক থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে, অনেক শ্রমিকই তাদের পরিবারকে নিয়ে আসে বাংলায়, ফলে তাদের গ্রামীণ জীবনের অন্যতম উৎসব ছট পুজা বাংলায় হতে শুরু করে। এই সময় পর্বে এই উৎসব এত জনপ্রিয় না হলেও কালক্রমে এই বাঙালি ও অবাঙালি উভয়ের মধ্যে অতি পরিচিত ও প্রিয় এক উৎসবের রূপ নিতে থাকে। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল ষষ্টির দিন থেকে আগামি চার দিন ধরে উৎযাপিত এই উৎসব কোনও অর্থেই বাংলার দুর্গোৎসবের চেয়ে কম নয়।[১১]

একদা বাংলার মানুষ এই পুজা সম্পর্কে অবহিত ছিল না। থাকবেই বা কি করে, এই পুজায় ব্রাহ্মণদের তেমন প্রাধান্য না থাকায় এই পুজা হিন্দু ধর্মের প্রধান স্রোতে তেমন জায়গা করে নিতে পারি নি। তাই উপনিষৎ বা অন্য কোন ধর্ম পুস্তিকায় এই পুজা স্থান পাই নি। মূলত কালী পুজার ছয় দিন পর এই পুজোটি হয়ে থাকে, এই কারনেও হয় তো এইটি ছট (বাংলায় ষষ্টির কথ্য রুপ) নামে পরিচিত। মূলত সূর্য দেবতা কে আরাধনা করা হয় এই সময়।

ইদানীং বাঙালিদের কাছে এই পুজো যথেষ্ট পরিচিত এবং জনপ্রিয়। বাংলায় জন্মগ্রহন তথা বাংলায় শিক্ষাগ্রহণের ফলে শিশু বয়স থেকে বাঙালি বন্ধুদের মধ্যে এই পুজাকে কেন্দ্র করে অতি উৎসাহ দেখে আসছি। দেখে আসছি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তাদের এই পুজোয় অংশগ্রহন করতে। বস্তুত বাঙালিদের কাছে ছটপুজা আর 'ঠেকুয়া'র উৎসব প্রায় একাত্ম হয়ে উঠেছে। এই পুজো চারদিন ধরে চলে। এই চারদিন বাঙালি বন্ধুদের উপস্থিতি নজরে পরে অবাঙালি বন্ধুদের বাড়িতে। মজার বিষয় বিষয় হল এই সময় পর্বে একাধিক বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয় তাদের, যারা এই পুজো করে, কিন্তু লক্ষ্য করা যায় এই বিধিনিষেধ শুধু এই অবাঙালি হিন্দুরাই মেনে চলে তা কিন্তু নয়, কালিপুজা ও দীপাবলির পর হিন্দু- মুসলিম- বাঙালি নির্বিশেষে সকলে এই বিধিনিষেধ মেনে চলে। পুজোর চারদিন প্রায় সকলেই আমিষ বর্জন করে চলে, হিন্দিভাষী হিন্দুরা রসুন ও পেঁয়াজও বর্জন করে চলে।[১২]

ছটপুজোর প্রথম দিন 'নহা খা' বা 'কদুয়া ভাত' (লাউ ভাত) নামে পরিচিত। এদিন বাড়িতে ভাত ও লাউ সেদ্ধ তৈরি হয়, অন্যান্য খাবারে অল্পবিস্তর লাউ এর ব্যবহার করা হয়। বাড়ির সকলে একসাথে খবার খায়। বাচ্চা বয়স থেকে বাড়ির পাশে থাকা বাঙালি বন্ধুকেও লাউ ভাত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেখেছি। পরের দিন খরনা নামে পরিচিত। এদিন 'পরবতিন' (বাড়ির বয়স্ক মহিলা যিনি পুজো পরিচালনা করেন) বিকেল পর্যন্ত নির্জলা থাকেন, সকালে গঙ্গাস্নান ও গঙ্গা থেকে মাটি আনা হয়। সেই মাটি ও নতুন ইট দিয়ে উনুন তৈরি হয় যাবতীয় প্রসাদ এই উনুনেই তৈরি হবে। বিকেল ৭ থেকে ৮ টার মধ্যে বাড়িতে ছট্টি মইয়ার আরাধনা হয়। এই সময় পুরো পাড়া জুড়ে অদ্ভুত এক নীরবতা পালন করা হয়। পুজোর শেষে পরবতিনকে সকলে প্রনাম জানায়

এবং প্রসাদ হিসেবে পায়েস বা ক্ষীর, রুটি, কলা গ্রহন করে। বিবাহিত মহিলারা গেরুয়া সিঁদুর নাক থেকে শিথি পর্যন্ত লেপে নেন। তৃতীয় দিন 'পয়লা অর্ঘ্য' নামে পরিচিত, এদিন সকাল থেকে নির্জলা থাকতে হয় এবং অস্তমিত সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করতে হয়। বিকেলে সূর্যাস্তের আগে মাথায় প্রসাদের থালা ও কাঁধে কলার কাধি নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে গঙ্গায় যাওয়া এবং কুলোয় ঠেকুয়া, কলার ছড়া, নারকেল ও অন্যান্য ফলমূল সাজিয়ে সূর্যকে আরাধনা করা হয়। চতুর্থ দিন 'দুসলা অর্ঘ্য' নামে পরিচিত। এদিন ভোর সকালে সূর্যোদয়ের আগে একই ভাবে মাথায় প্রসাদের থালা ও কাঁধে কলার কাধি নিয়ে খালি পায়ে গঙ্গা যাওয়া হয় এবং অনুরূপ ভাবে উদীয়মান সূর্যকে আরাধনা করা হয়। এদিন সকালে উপোস ভাঙ্গা হয় সরবত ও মিষ্টি খেয়ে। পুজো সাধারণত সন্তান প্রাপ্তি, স্বামীর আরোগ্যা, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির জন্য করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই উৎসবেও মহিলারাই থাকে প্রাণকেন্দ্রে। অত্যন্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সাথে চটকল শ্রমজীবীদের এই পুজা করতে দেখা যায়। প্রথম দিকে বাঙালিরা এই উৎসব সম্পর্কে তেমন উৎসাহ না দেখালেও পরবর্তীকালে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে পালিত এই উৎসবে শুধুমাত্র অবাঙালিরা অংশগ্রহন করে তাই নয়, ইদানীং বহু বাঙালিদের বাড়িতেও এই পুজো হতে দেখা যায়। বাংলার প্রধান উৎসব দুর্গাপুজা যতটা এই অবাঙালিরা আপন করে নিয়েছে, বাংলা ততটাই গ্রহন করে নিয়েছে অবাঙালিদের আত্মপরিচয়ের প্রধান উৎসব ছটপুজোকে।[১৩]

হোলি

শুধু বাংলা নয়, সমগ্র উত্তরভারত জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে এই উৎসব পালিত হয়। স্থান বিশেষে এই উৎসবের গল্পকথাও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন, বাংলা ও উড়িষ্যা জুড়ে এই উৎসব মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মোৎসব হিসাবে পালন করা হয়, আবার কোথাও অসুর হিরণ্যকশ্যপের ওপর ভগবান নারায়ণ ও ভক্ত প্রহ্লাদের বিজয়ের স্মরণে এই দিনটি উৎযাপিত হয়ে থাকে, রাধা- কৃষ্ণের রঙের খেলাকেও এই উৎসবের উৎস হিসেবে ধরা হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে এর সাথে জড়িয়ে আছে কামা-রতির গল্পকথা। বর্তমানে খুব উৎসাহের সাথে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে এই উৎসব পালিত হলেও, একদা এটি

ছিল দলিতের উৎসব। ব্রাহ্মণরহিত এই উৎসব হিন্দু ধর্মের মূলস্রোতে নিচু জাতির উৎসব রূপেই পরিচিত ছিল। ভোজপুরী লোকউক্তিতে বলা হয়ে থাকে

"ব্রাহ্মণ কে রচ্ছা বন্ধন, ছতরী কে দসহরা।
বৈস কে দেওয়ালী, আ নীচ্চন কে হোলি।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জন্য রাখী পূর্ণিমা, ক্ষত্রিয়দের জন্য বিজয়াদশমী, বৈশ্যদের জন্য দীপাবলী ও ছোট জাতির জন্য হোলি উৎসব। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বর্তমানে ভাইদের হাতে বোন বা দিদিরা রাখী বাঁধলেও, একদা এই কাজ সমাজের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণরাই করত, বিজয়া দশমীর দিন রাম রাবণকে হত্যা করে যুদ্ধ জয় করেন বলে সেই দিনটি ক্ষত্রিয়দের কাছে বিশেষ সম্মানের দিন, অন্য দিকে দীপাবলি মূলত লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয় তাই বৈশ্য, যারা মূলত ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত থাকে এই উৎসবটি তাদের কাছে বিশেষ একটি দিন, তবে হোলি উৎসবটি হল দলিতদের। এই উৎসবকে দলিতদের উৎসব বলার অনেক কারণ আছে। প্রথমত, 'ছট পুজোর' মতই এই উৎসবে ব্রাহ্মণদের কোন স্থান নেই। বিহার উত্তরপ্রদেশ তথা বাংলার বিস্তীর্ণ চটকল অধ্যুষিত অঞ্চলে দোলযাত্রার পরের দিন হোলি উৎসব পালন করা হয়। দ্বিতীয়ত কথিত আছে – শৈশবে পুতনার বিষাক্ত দুগ্ধপান করে কৃষ্ণের গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়, যৌবনে কৃষ্ণ যখন রাধার প্রেমে পরে সে তখন তাঁর গায়ের রঙের জন্য চিন্তিত হয়ে পরে। সে ভাবে রাধার মত সুন্দরী মেয়ে তাঁর কালো রঙের জন্য তাকে নাকচ না করে দেয়। তাঁর এই হতাশা দেখে তাঁর মা তাকে রাধার কাছে যেতে বলেছিলেন ও তাঁর মুখে রাধাকে রাধার পছন্দমত যে কোন রঙ মাখিয়ে দিতে বলেছিলেন। কৃষ্ণ তাই করেন, এবং তারপরই তাঁদের প্রেমপর্ব শুরু হয়। এই উপাখ্যানে দুটি দিক খুব স্পষ্ট, প্রথমত, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম, যার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়ে থাকে, দ্বিতীয়ত, বর্ণভেদ যা এই উৎসবের ইতিহাসে বিস্মিত। গায়ে কালো রঙ ও সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীকে দর্শায়, তাই তো কোনও দলিত বা আদিবাসীর গাত্রবর্ণ ফর্সা হলেই তাকে অহরহ শুনতে হয় 'দেখে তুমি আদিবাসী মনে হও না'। কৃষ্ণবর্ণের মানুষ তথা অনার্যদের মধ্যে তাই এই উৎসব বিশেষ জনপ্রিয়। তারা তাঁদের গাত্রবর্ণের জন্য সমাজে ছিল অচ্ছুৎ। হোলি উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাঁদের সমানাধিকারের দাবীই তুলে ধরে। তৃতীয়ত, রঙের

এই উৎসবে প্রথাগত কোন পুজো হয় না। পূর্বপুরুষদের স্মরণ করলেও, প্রথাগত কোন রীতিনীতি আচার-আচরণ মানা হয় না, যা উৎসবটির অনার্য চরিত্র পরিস্ফুট করে। চতুর্থত, হোলি উৎসব চটকল অধ্যুষিত হিন্দিভাষীদের কাছে আমোদপ্রমোদের উৎসব, এই দিন প্রত্যেকের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি হয়, যেমন, লুচি, পোয়া-পিঠে, ক্ষীরের পাশাপাশি আমিষ খাবারেরও প্রাধান্য থাকে। অন্যদিকে এই উৎসবের দিন চটকল শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় সকলে ভাঙ, দেশি-বিদেশী মদ ও অন্যান্য ধরনের মাদক দ্রব্য খেয়ে থাকে। প্রচলিত বর্ণাশ্রমের শুদ্ধ অশুদ্ধের যে ধারণা তাতে স্বাভাবিক ভাবেই এই উৎসব হিন্দুধর্মের মূল স্রোতে স্থান পায় না। পঞ্চমত, বাংলার চটকল অধ্যুষিত অঞ্চলে হোলি উৎসবে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরাও বৃহৎ সংখ্যায় যোগদান করে। মুসলিমরা মিলে কাজ করতে আসা হিন্দু শ্রমিকদের বাড়িতে আসে, উৎসবে অংশগ্রহন করে। হোলি একটি প্রাচীন হিন্দু উৎসব রূপে পরিচিত হলেও, মধ্যযুগে মুসলিমদের ভারতে আগমনের পর সুলতানি তথা মুঘল আমলেও সুলতান বা মুঘল সম্রাটদের খুব সহজে হোলি উৎসব উৎযাপনের করার একাধিক প্রমান আমরা পাই। মুসলিমদের এই উৎসবে অংশগ্রহনে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কোন প্রতিবাদের কথা আমরা জানতে পারি না, সম্ভবত দলিতদের এই উৎসব নিয়ে উচ্চ বর্ণের মানুষদের কোন মাথাব্যাথা ছিল না তাই কোন প্রতিবাদও দেখা যাই নি। যদিও অধুনা এই উৎসব এক অন্য মাত্রা লাভ করেছে। একদা বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে যে উৎসবের জন্ম তা আজ প্রেমের উৎসবের রূপ নিয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকলের উৎসবে পরিণত হয়েছে।[১৪]

মকর সংক্রান্তি

চটকল হিন্দিভাষী হিন্দুদের অন্যান্য উৎসব গুলির মধ্যে আর একটি অন্যতম উৎসব হল মকর সংক্রান্তি, যেটি দহি-চুড়া বা খিচুড়ি নামেও বহুল প্রচলিত। বাংলায় পৌষ সংক্রান্তি,তামিলনাড়ুতে পোঙ্গল, গুজরাটে উত্তরায়ণ, অসমে ভোগালি বিহু, কর্ণাটকে মকর সংক্রমণ তথা কাশ্মীরে শায়েনক্রাত নামে প্রচলিত এই উৎসব আসলে একটি ফসলি উৎসব।[১৫] স্বাভাবিক কারনেই চটকল হিন্দিভাষী শ্রমজীবীদের জীবনে এই উৎসবের একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। প্রথমত, এই শ্রমজীবীদের আদি জীবিকা ছিল কৃষি,

গ্রামের সাথে তাদের যোগাযোগ প্রায় ক্ষীণ হলেও এই উৎসব গুলির মধ্য দিয়ে তারা তাদের শিকড়কে খুঁজে পায়।

অন্যদিকে সংক্রান্তি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল সঞ্চার বা যাওয়া। পুরোপুরি এক জায়গা থেকে আর একটা জায়গা যাওয়া মানেও সংক্রান্তি। যদিও সংক্রান্তি শব্দটি যখন মাসের প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করা হয়, তখন তাঁর অন্তরালে কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রসঙ্গ প্রচ্ছন্ন থাকে।[১৬] এই শ্রমজীবীদের জীবনের সাথে সংক্রান্তি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। একদা তাদের পূর্বপুরুষ জীবিকার খোঁজে নিজ ভিটেমাটি ছেড়ে বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক তারা কখনই ছিন্ন করেনি, তবে তাদের এই অভিপ্রায়ন ও ক্রমে বাংলায় ধীরে ধীরে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া স্মরণ করা হয়ে থাকে মকর সংক্রান্তির মধ্য দিয়ে।

মূলত জানুয়ারি মাসের ১৪ বা ১৫ তারিখে এই উৎসব উৎযাপন করা হয়ে থাকে। মূলত এই উৎসবও পুরোহিতবর্জিত উৎসব। এই উৎসবে পূর্বপুরুষদের আত্মার তৃপ্তি কামনা করা হয়। কথিত আছে মকরসংক্রান্তির সূর্যোদয়ে যিনি গঙ্গা স্নান করবেন, তিনি মাতৃ ও পিতৃকুলের সাতপুরুষের তৃপ্তির ব্যবস্থা করেন। বাংলার হিন্দিভাষী শ্রমজীবীদের মধ্যেও এদিন গঙ্গানদী জুড়ে ঢল নামতে দেখা যায়। সকাল সকাল স্নানাদি সম্পন্ন করে দই-চুড়ো, গুড়, ভিন্ন প্রকারের তিলকুট ইত্যাদি খাওয়া হয়। খাওয়ার পূর্বে এই খাবারগুলো পূর্বপুরুষদের অর্পণ করা হয়। বিকেল থেকে শুরু হয় সম্মিলিতভাবে খিচুড়ি রান্নার আয়োজন। রাতে খিচুড়ি খাওয়ার মধ্য দিয়ে এই উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। বাংলায় পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে পুলি, পায়েস প্রভৃতি নানা প্রকার খাবার খাওয়ার চল থাকলেও বাংলার চটকল হিন্দিভাষী শ্রমজীবীদের মধ্যে দই চুড়ো, তিলের তৈরি তিলকুট, গুড় প্রভৃতির প্রাধান্য (যেগুলি প্রধানত বিহার, উত্তরপ্রদেশে নতুন ফসল হিসেবে উৎপাদিত হয়ে থাকে) বাংলায় তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য আমাদের কাছে যেমন তুলে ধরে তেমনি তাদের গ্রামীণ সংস্কৃতি আঁকড়ে থাকার প্রবণতাও ফুটে ওঠে এই উৎসবের মধ্য দিয়ে। এর পাশাপাশি এই উৎসব চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে মিলন উৎসবে পরিণত হয়। বাংলায় থাকা আত্মীয়স্বজন, গ্রাম্য পরিচিত ব্যক্তিবর্গ একে ওপরের বাড়িতে ভোজন আহারাদি সম্পন্ন করে কমিউনিটিগত ঐক্যকে আরও দৃঢ় করে।[১৭]

দীপাবলি বা দিয়ালী

বাংলার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে আর একটি উৎসব বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হল দীপাবলি বা দিয়ালী। আলোর উৎসব রূপে পরিচিত দিয়ালী বাংলায় মূলত নভেম্বের মাসে কালীপুজোর পর দিন উৎযাপিত হয়। বাংলায় মূলত অসুর শক্তিকে বিনাশ করে মা কালী অন্ধকার দূর করেছিল বলে বাংলার প্রত্যেক বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়ে অধুনা আধুনিক লাইটিং আর ব্যাবস্থা করে এই দিনটি পালিত হয়। অন্যদিকে উত্তর ভারতে বিশেষত উত্তর প্রদেশ ও বিহারে রামের দীর্ঘ ১৪ বছর বনবাস কাটিয়ে বাড়ি ফেরার আনন্দে বাড়িঘর প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোকিত করা তথা বাজি পুড়িয়ে মহা আনন্দে রামকে বরণ করে নেওয়ার চল আজও উত্তর ভারত জুড়ে লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় বসবাসকারী হিন্দিভাষী হিন্দু শ্রমজীবীদের মধ্যেও এই উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে তাদের সেই সাংস্কৃতিক দিকই ফুটে ওঠে। একদা এই শ্রমজীবীরাও পরিবার থেকে দূরে কাজের খোঁজে দীর্ঘদিন বনবাসে থাকত। ৬০ এর দশক পর্যন্ত দেখা গেছে বাংলার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে দলে দলে শ্রমজীবীরা বাড়ি ফিরে যাওয়ার মরিয়া চেষ্টা করত, চটকল অঞ্চলগুলি পুজোর মরশুমে প্রায় জনশূন্য হয়ে যেত। বাংলায় দীর্ঘদিন বনবাস কাটিয়ে ফিরে যেতে গ্রামে, যদিও রামের মত হয়তো তারা রাজত্ব ফিরে পেত না, কিছুদিন পরিবারের সাথে আনন্দে দিন কাটিয়ে আবার রওনা দিতে হত বনবাসে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সপরিবারে বাংলায় স্থায়ী বসবাস করায় এই উৎসবের চল বাংলাতেও লক্ষ্য করা যায়।

প্রায় এক মাস ধরে এই পুজো প্রস্তুতি চলতে থাকে। প্রায় প্রত্যেকের বাড়ি পরিষ্কার ও রঙ করা হয়। বাড়ি ও উঠোন জুড়ে বিভিন্ন ধরনের রঙ্গোলী তৈরি করা হয়, বাড়িকে সাজানো হয় লাইট দিয়ে। বাজার জুড়ে দেখা যায় বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন ধরণের খেলনা। উৎসবের দিন প্রায় প্রত্যেক অবাঙালি হিন্দুদের বাড়িতে গনেশ লক্ষ্মীর পুজো হয়। খই, লাড্ডু, ভিন্ন আকৃতির বাতাসা মিঠাই, বাতাসা ইত্যাদি দিয়ে পুজো করা হয়, লক্ষণীয় বিষয় এই পুজোতেও ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন হয় না, বাড়ির মেয়েরাই এই পুজো সম্পাদন করে।

এই উৎসবের আর একটি দিক হল বাচ্চাদের জন্য ঘরোনা তৈরি করা। পূর্বে প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে বাচ্চাদের জন্য মাটি বা ইটের ছোট ঘর তৈরি করা হত, অধুনা বিশ্বায়নের প্রভাবে সেই মাটি বা ইটের বাড়ি, কাটুন বা শোলার বাড়িতে পরিণত হয়েছে, যা বাজারে রেডিমেড পাওয়া যায়। গ্রাম থেকে প্রায় ছিন্নমূল এই শ্রমজীবীদের জীবনে একটি বাড়িঘর তৈরি করার যে আশা আকাঙ্ক্ষা তা প্রতিফলিত হয় শোলা বা কাটুনের বাড়ির মিনিয়েচের থেকে। তারা শুধু স্বপ্ন দেখত তাই নয় তা তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও এই স্বপ্ন উপহার দিয়ে যেত। এককথায় এই উৎসব তাদের বাস্তব জীবনের সম্মুখীন করত তেমনি বাঁচার, জীবন সংগ্রামের রসদও দেয়।[১৮] স্বাভাবিক ভাবে এই সমস্ত উৎসবের মধ্য দিয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রতিবাদ, ভালোবাস, কৌমবোধ প্রতিফলিত হয়।

সূত্রনির্দেশ

১. বি. ফলি, রিপোর্ট অন লেবার ইন বেঙ্গল (কলকাতা-১৯০৬)।
২. অমল দাস : ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক উনিশ শতক থেকে বিশ শতক, পৃষ্ঠা নং-৭২।
৩ . অমল দাস : বাংলার চটকল শ্রমিকদের চটকল বহির্ভূত জীবন (১৮৭০ এর দশক থেকে ১৯২০ র দশক), অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৩ পৃষ্টা- ১১২।
৪. তদেব।
৫. ক্ষেত্রসমীক্ষা, গারুলিয়া, ভাটপাড়া, টিটাগড়।
৬. অমল দাস তদেব।
৭. ইজমা রিপোর্ট, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৬৪।
৮. লোকশ্রুতি, গারুলিয়া ক্ষেত্রসমীক্ষার দরুন এই প্রবাদের কথা জানতে পারি, যদিও এর অর্থ কেউ বলতে পারেনি।
৯. জি ডি, তারিখ- ২২/০৯/২০১৬, নোয়াপাড়া থানা, গারুলিয়া।

১০. আলোক মৈত্র, হাবেলিশহরের লৌকিক ধর্মে সংস্কৃতি ও সমাজ, এখন প্রকাশনী, ১৯৯৪, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৩৯-৪০।

১১. তদেব।

১২. ক্ষেত্রসমীক্ষা, গারুলিয়া, ভাটপাড়া, টিটাগড়।

১৩.https://drive.google.com/file/d/1OS4O6A9eqFSVTk2XBY2WNwwHHGdMYlnF/view?usp=sharing, ১৯/০৩/২০২১, শত্রুঘ্ন কাহার, ব্রাহ্মণদের দাপট নেই, এই পুজো তাই হিন্দুধর্মের মূল স্রোতে তাই জায়গা পাইনি, এই মুহূর্ত, ৩০/১০/২০১৯।

১৪.https://drive.google.com/file/d/1i780z6i2h5C8eWOtXxZRpy2Ww2MMjZ5o/view?usp=sharing, ১৯/০৩/২০২১, শত্রুঘ্ন কাহার, দলিতের উৎসব দোল, খোয়াবনামা খবর, তারিখ- ১৬/০৪/২১।

১৫. লোকনাথ চক্রবর্তী, মকর সংক্রান্তি, সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৬জানুয়ারি, ২০২১, পৃষ্ঠা- ৮।

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭।

১৭. ক্ষেত্রসমীক্ষা, গারুলিয়া, ভাটপাড়া, টিটাগড়।

১৮. তদেব।